বিপথগামী হিন্দুধর্ম ও হিন্দুর ভবিষ্যৎ

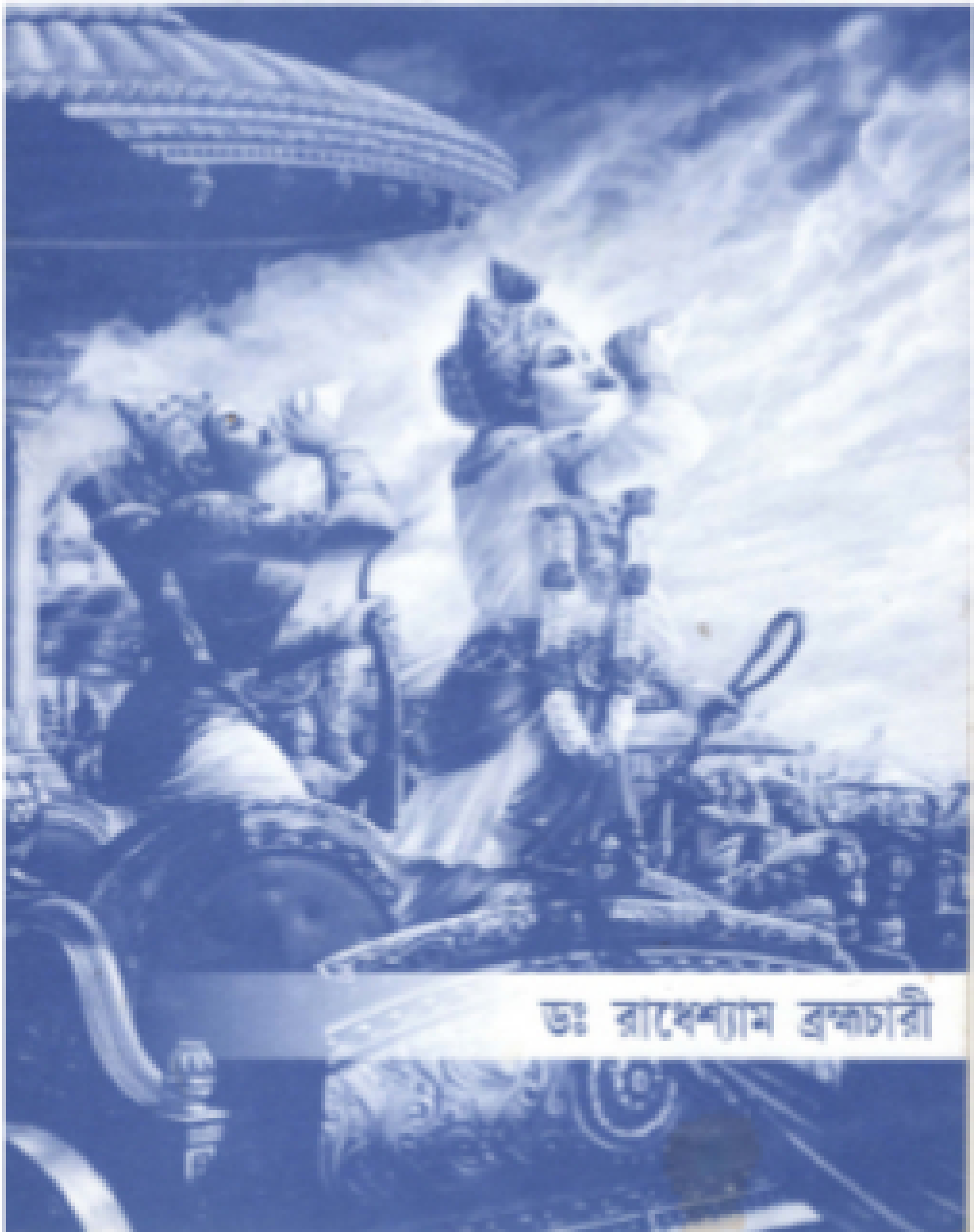

ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

বিপথগামী হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুর ভবিষ্যৎ

ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

বিপথগামী হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুর ভবিষ্যৎ
ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী
হিন্দুত্ববুক্স
স্ক্যান করেছেন শ্রী অভিজিৎ মাহাতো।
https://hindutvabooks.com
https://facebook.com/hindupustakkendra
https://twitter.com/hindutvabooks
mailto:hindutvabooks@gmail.com
https://t.me/hindutvabookschannel

ভূমিকা

বিগত ২০০৭ সালের ৩০শে ডিসেম্বর শ্রীশ্রী সারদাদেবীর ১৫৫ তম জন্মতিথি মহাসমারোহে পালিত হল। এই উপলক্ষে প্রচারিত একটি টিভি চ্যানেলে একজন বক্তা মায়ের মহত্ত্ব বর্ণনা করতে বলেছেন যে, তিনি এতই মহান হৃদয়ের মানুষ ছিলেন যে তিনি বলতেন, "আমি সৎ-এরও মা, আবার অসৎ-এরও মা"। অর্থাৎ একজন সৎকর্মশীল মানুষকে মা যেমনভাবে আশীর্বাদ করবেন, একজন দুষ্কৃতকারীকেও তিনি ঠিক তেমনভাবেই আশীর্বাদ করবেন, বা তার মঙ্গল কামনা করবেন। ধরা যাক একজন খুনী কাউকে খুন করে মায়ের কাছে গেল এবং যাকে খুন করা হয়েছে তার কোন আত্মীয়ও মায়ের কাছে গেল। এই পরিস্থিতিতে মা খুনীরও মঙ্গল কামনা করবেন এবং মৃত ব্যক্তির আত্মীয়েরও সমানভাবে মঙ্গল কামনা করবেন। অথবা কোন ধর্ষিতা মহিলা ও তার ধর্ষণকারী, দুজনই যদি মায়ের কাছে উপস্থিত হয় তবে মা ধর্ষিতা মহিলা ও ধর্ষণকারী, উভয়কেই একই ভাবে আশীর্বাদ করবেন। সর্বোপরি, হিন্দু হত্যাকারী কোন মুসলমান যদি মায়ের কাছে যায় তবে মা তাকেও কোল দেবেন, আদর করবেন, মঙ্গল কামনা করবেন এবং আশীর্বাদ করবেন।

এসব কথা শুনতে হয়তো কারো ভালো লাগতে পারে। কিন্তু একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, এই ধরনের আচরণ মোটেই হিন্দু ধর্ম সম্মত নয়। যদি এরকম আচরণ হিন্দুধর্ম সম্মত হোত তবে মা কালীর বলা উচিত ছিল, "আমি দেবতাদেরও মা এবং অসুরদেরও মা"। সুতরাং খড়্গ দিয়ে অসুর কেটে, তাদের কাটা মুণ্ড দিয়ে মালা বানিয়ে গলায় পরে এবং অসুরের রক্ত গায়ে মেখে কালী খুবই অন্যায় কাজ করেছেন। মা দুর্গার বলা উচিত ছিল যে তিনি অসুরদেরও মা। তাই মহিষাসুরকে হত্যা করে তিনি খুবই অন্যায় কাজ করেছেন। ভগবান বিষ্ণুর বলা উচিত ছিল যে তিনি দেবতাদেরও ভগবান এবং অসুরদেরও ভগবান। তাই তিনি হিরণ্যকশিপু, মধু-কৈটভ ইত্যাদি অসুরদের নিধন করে খুবই অন্যায় কাজ করেছেন। শ্রীরামচন্দ্রের বলা উচিত ছিল যে তিনি রাবণেরও ভগবান, তাই রাবণবধ করে তিনি মহা অন্যায় কাজ করেছেন। তেমনি, শ্রীকৃষ্ণেরও বলা উচিত ছিল যে তিনি পাণ্ডবদেরও ভগবান এবং কৌরবদেরও ভগবান। তাই কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করে এবং তাদের হত্যা করে তিনিও খুব অন্যায় কাজ করছেন।

আসল কথা হল, হিন্দু ধর্ম কখনও অন্যায়কারী বা দুষ্কৃতকারীকে ক্ষমা করতে বা তাকে জড়িয়ে আদর করতে বলেনি। পক্ষান্তরে অন্যায়কারী ও দুষ্কৃতকারীদের উপযুক্ত শাস্তি দেবার কথাই হিন্দু বলে এসেছে এবং বলছে। এই কারণে সমস্ত হিন্দু দেবদেবীর হাতে শোভা পাচ্ছে অস্ত্র। শ্রীরাম ধনুর্বাণধারী, শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শনচক্রধারী, শিব ত্রিশূলধারী, মা কালী খড়্গাধারিণী এবং মা দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী। এ ব্যাপারে বশিষ্ঠ সংহিতা বলছে,

অগ্নিদো গরদোশ্চৈব শস্ত্রপাণীর্ধনাপহঃ।
ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতেহ্যাততায়িনঃ॥ (৩/১৬)

অর্থাৎ, অগ্নিদাতা, বিষদাতা, ধারালো অস্ত্র হাতে আক্রমণকারী, ধনসম্পদ লুণ্ঠনকারী, জমি-জায়গা দখলকারী এবং ঘরের রমণীদের অপহরণকারী, এই ছয় রকমের দুষ্কৃতকারীকে আততায়ী বলতে হবে। এই আততায়ীদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হবে সে ব্যাপারে মনুসংহিতা বলছে,

গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতম্।
আততায়ীনমায়ান্তং হন্যাদেবাহবিচারয়ম্॥ (৮/৩৫০)

অর্থাৎ সেই আততায়ী যদি গুরু হয়, বালক হয় বা বৃদ্ধ হয়, ব্রাহ্মণ হয় বা বহু লেখাপড়া জানা

বিদ্বান ব্যক্তিও হয়, তবে সেই অগ্রসরমান আততায়ীকে কোন বিচার বিবেচনা না করে তৎক্ষণাৎ হত্যা করতে হবে। পক্ষান্তরে মা সারদা যদি বলেন যে তিনি আক্রমণকারী সেই অসৎ-এরও মা, এবং তাই তাকে আঘাত না করে রক্ষা করতে হবে, তবে তাঁর সেই আচরণ হবে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু শাস্ত্রের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল যে, উপরিউক্ত শাস্ত্রীয় নির্দেশ হল সেই সব আততায়ীদের জন্য যারা এক জন ব্যক্তিবিশেষের ক্ষতি করতে উদ্যত। কিন্তু যে সব আততায়ী সমগ্র একটি অসহায় ও নিরপরাধ মানব গোষ্ঠীর ক্ষতি করতে উদ্যত, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত আততায়ীদের সমূলে বিনাশ করার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। তাই তিনি গীতায় বলেছেন,

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ (৪/৮)

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল, উপরিউক্ত শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শুধু নাশায় না বলে বিনাশায় বলেছেন। নাশ বলতে শুধু একজন ব্যক্তিকে হত্যা করা বোঝায়। কিন্তু বিনাশ বলতে সমস্ত শত্রুকে ঝাড়ে বংশে হত্যা বোঝায়। যদি সম্রাট্ পৃথ্বীরাজ চৌহান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে মহম্মদ ঘোরি ও তার সমস্ত বন্দী সৈন্য সামন্তকে সদলে হত্যা করতেন তবে হিন্দুজাতিকে ৮০০ বছরের লজ্জাজনক দাসত্ব করতে হোত না।

তামসিক ও ক্লীব ভক্তিবাদ

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হল, আজ হিন্দু জাতি হিন্দু ধর্মের প্রকৃত নির্দেশ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছে। হিন্দু ধর্ম আজ সম্পূর্ণ বিপথগামী হয়ে পড়েছে। তাই হিন্দুরা আজ হিন্দু ধর্মের নামে যা অনুসরণ করে চলেছে, তাকে হিন্দু ধর্ম বললে সত্যের অপলাপ করা হয়। উপনিষদের মূল বাণীই হল, তোমার দেহ ও আত্মা পৃথক। তাই তোমার দেহ বিনাশপ্রাপ্ত হয় কিন্তু তোমার আত্মা অবিনশ্বর। তাই মৃত্যুভয় ত্যাগ কর। ভয়শূন্য বা অভীঃ হও।

কিন্তু হিন্দু ধর্মের সেই তেজোবীর্যের বাণী, সেই সাহস ও বীরত্বের বাণী সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে হিন্দু জাতি আজ পরিণত হয়েছে এক কাপুরুষের জাতিতে। আর হিন্দু ধর্ম পরিণত হয়েছে শুধু ফুল মালা দিয়ে ঠাকুর পূজা, চিনি বাতাসা প্রসাদ ও ঠাকুরের কাছে কেঁদে কেঁদে চোখের জল ফেলার ধর্মে। আমাকে মামলায় জিতিয়ে দাও, আমার ছেলেকে চাকরি জোগাড় করে দাও, বা আমার মেয়ের জন্য ভালো পাত্র জোগাড় করে দাও—ঠাকুরের কাছে কেঁদে কেঁদে এই সব জাগতিক বিষয় প্রার্থনা করার ধর্মে।

যারা কালী ভক্ত তাঁরা বিশাল বিশাল কালী মন্দির তৈরি করছেন। রোজ লাল লাল জবা ফুল দিয়ে মাকালীর বিগ্রহকে পূজা করছেন এবং বাতাসা প্রসাদ দিচ্ছেন। আর মা মা বলে কেঁদে কেঁদে চোখের জল ফেলছেন। আর ভাবছেন, এ ভাবে পূজা করলেই মা তার প্রতি সদয় হবেন। মা এমন সদয় হবেন যে, জগজ্জননী মা প্রয়োজনে তার বেড়া বাঁধার সময় দড়ি ফিরিয়ে দেবেন। যেন জগজ্জননীর আর কোন কাজ নেই। তাঁদের মতে এ ভাবে কেঁদে কেঁদে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীরামপ্রসাদ কালীর দেখা পেয়ে মহান হয়েছেন। কাজেই এটাই পথ। এই সব নির্বোধ ভক্তের দল মায়ের রূপটার দিকে তাকিয়ে দেখেন না যে মা তার কাছে কী চাইছেন। মা তাকে তাঁর রূপের মধ্য দিয়ে এটাই বলতে চাইছেন যে, আমার মতই তোরা খড়্গ দিয়ে দুষ্কৃতকারীদের মাথা কাটবি, তাদের কাটা মুণ্ড হাতে নাচবি আর

তাদের রক্ত গায়ে মাখবি। মা কোথাও বলেননি যে, আমার সামনে মা মা বলে কাঁদবি আর চোখের জল ফেলবি। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মা বলেছেন, পশু বলি দিয়ে সেই রক্তমাখা মাংস দিয়ে আমার পূজা করবি। সেই মাকে এই নির্বোধ ভক্তের দল চিনি বাতাসা দিয়ে পূজা করে চলেছেন। মা তাদের এই পূজা গ্রহণ করেন বলে মনে হয় না।

যারা রামসাধক তাঁরা রাম-সীতার মূর্তি বানিয়ে তাকে ফুল-মালা দিয়ে পূজা করছেন, রাম নাম কীর্তন করছেন আর চিনি বাতাসা প্রসাদ দিচ্ছেন। এক কথায়, এই সব ভক্তের দল মাংসাহারী ক্ষত্রিয় রামকে একজন নিরামিষভোজী দেবতায় পরিণত করেছেন। আর এ ভাবে যাঁরা পূজা অর্চনা করছেন তাঁরাই বিশাল রামভক্ত হিসাবে পরিগণিত হচ্ছেন। কিন্তু তাঁরা একবারও রামের হাতের ধনুক ও পিঠের তূণীরের দিকে লক্ষ্য করছেন না। এবং সেই ধনুর্বাণ দিয়ে শ্রীরামচন্দ্র যে রাবণের মত দুষ্কৃতকারীকে সবংশে নিধন করেছিলেন তা স্মরণ করছেন না। তাই মনে প্রশ্ন জাগে, প্রকৃত রামভক্ত কে? যিনি রোজ রামের পূজা করছেন এবং সুন্দর ভাবে রানের ভজন কীর্তন করতে পারেন, তিনিই কি রামভক্ত? না, প্রকৃত রামভক্ত হলেন তিনি, যিনি রামের মতই ধনুর্বাণ ও অন্যান্য অস্ত্র চালনায় নিপুণ এবং সেই অস্ত্র দিয়ে যিনি দুষ্কৃতকারীদের হত্যা করতে নিপুণ।

শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন ক্ষত্রিয়। যারা দেশ ও জাতিকে ক্ষতের হাত থেকে রক্ষা করেন তাঁরাই হলেন ক্ষত্রিয়। মনুসংহিতা অনুসারে এই ক্ষত্রিয়দের সমস্ত রকমের পানাহার বৈধ ছিল। বাল্মীকি রামায়ণে অন্তত পনেরো জায়গায় বর্ণনা আছে যে, বনবাস কালে শ্রীরাম বন্য প্রাণী শিকার করে নিয়মিত মাংসাহার করতেন। কোথাও দেখা যাচ্ছে শ্রীরাম হরিণ বা বন্য বরাহ শিকার করে তা পুড়িয়ে স্ত্রী সীতা, বনের মুনি-ঋষিগণ ও ভাই লক্ষ্মণের সঙ্গে তা আহার করছেন। আবার ককহনও দেখা যাছে যে তিনি বেশ বড় একটা গোসাপ শিকার করে তা পুড়িয়ে আহার করছেন। (এই লেখকের "শ্রীরামচন্দ্র মাংসাহারী ছিলেন—বাল্মীকি রামায়ণ" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) কাজেই আজকের রামভক্তদের চিনি বাতাসা তিনি গ্রহণ করেন বলে মনে হয় না। এ ব্যাপারেও কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, রাম নিরামিষভোজী হলে লঙ্কা আক্রমণ করে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করার পরিকল্পনা ত্যাগ করতেন। বদলে তিনি লঙ্কায় শান্তিদূত পাঠাতেন এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে সীতা উদ্ধারের চেষ্টা করতেন। অহিংস সত্যাগ্রহ অথবা আমরণ অনশন শুরু করতেন। আর তা ব্যর্থ হলে সীতা উদ্ধারের চিন্তা পরিত্যাগ করতেন।

যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করছেন, অর্থাৎ যাঁরা বৈষ্ণব, তাঁরা আরও এক ধাপ এগিয়ে আছেন। তাঁরা রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি তৈরি করে পূজা অর্চনা করছেন। কিন্তু যেই রাধার মূর্তি তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের পাশে বসিয়েছেন, বাস্তবে সেই রাধার অস্তিত্বই ছিল না। একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবদ্ পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের প্রামাণ্য জীবনী আছে, সেই ভাগবদ্ পুরাণে রাধার উল্লেখ নেই। কিন্তু সেই কল্পিত রাধাকে নিয়ে চর্বিত চর্বণের শেষ নেই। রাধার মানভঞ্জন, রাধার নৌকাবিলাস, ইত্যাদি রাধাকৃষ্ণের কল্পিত প্রেমলীলা নিয়ে পালা গানেরও শেষ নেই। জটিলা, কুটিলা, আয়ান ঘোষ ইত্যাদি কল্পিত চরিত্র সৃষ্টি করে কত রসাল কাহিনী, শুনলে মাথা খারাপ হবার জোগাড়। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে রাধাকৃষ্ণের যে রতিলীলার বর্ণনা আছে তা পর্নোগ্রাফির পর্যায়ে পড়ে। সব থেকে ক্ষতিকর বিষয় হল, রাধাকৃষ্ণের এই সব কল্পিত প্রেম লীলার আবর্তে আসল শ্রীকৃষ্ণই কোথায় হারিয়ে গিয়েছেন। দুষ্টের দমনকারী, কংস ও জরাসন্ধের মতো অত্যাচারীদের নিধনকারী, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাঞ্চজন্য নিনাদকারী শ্রীকৃষ্ণ হারিয়ে গিয়েছেন। জগদ্গুরু যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ হারিয়ে গিয়েছেন। তাঁর জায়গায় স্থান নিয়েছেন বৃন্দাবনে বংশী বাদনকারী, কল্পিত রাধার সঙ্গে প্রণয়কারী এবং ষাট হাজার গোপিনীর মনোহরণকারী এক কল্পিত কৃষ্ণ, যাঁর হাতে সুদর্শন চক্রের বদলে শোভা পাচ্ছে বাঁশের বাঁশি। রাধার পাশে সেই মুরলীধারী কৃষ্ণকে ফুল-মালা দিয়ে পূজা

হচ্ছে, চিনি ও কলা বাতাসা প্রসাদ দেওয়া হচ্ছে আর নেচে নেচে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কীর্তন হচ্ছে। আর যাঁরা এই পূজা অর্চনা করছেন, তাঁরা ভাবছেন যে, তাঁরা যা করছেন সেটাই কৃষ্ণের প্রকৃত সাধন ভজন এবং এতেই মহাপুণ্যের কাজ হচ্ছে। এই সাধনার দ্বারাই তাঁদের মোক্ষলাভ হবে। কৃষ্ণের এই সব ক্লীব ভক্তেরা ভাবছেন যে, তাঁরা যে ভজন সাধনা করছেন সেটাই ঠিক।

এই তামসিক ভক্তিবাদের মূল কথাই হল, **পিতা মাতা ভ্রাতা আর বন্ধুগণ, সবই তোর পর, কেহ নয় আপন; পরপ্রেমে কেন হয়ে অচেতন ভুলিছ আপন জনে?**

অর্থাৎ, এক মাত্র ভগবানই তোমার আপন, আর সবাই পর। তোমার মা, বাবা, ভাই, বন্ধু, সবাই পর। তাই তোমার কাজ হল এই পরের ভাল মন্দের দিকে নজর না দিয়ে শুধু ভগবানকে ডাকা। ভাইয়ের বাড়িতে ডাকাত পড়েছে তাতে তোমার কী? তুমি ঘরে বসে ভগবানকে ডাকতে থাকো, শুধু তোমার নিজের মুক্তির কথা ভাবো। বৃথা কেন সাংসারিক ঝামেলার মধ্যে জড়াতে যাবে? ভগবানকে ডাক, তিনিই সব ঝামেলা থেকে মুক্ত করবেন—

জয় জগদীশ হরে, ভক্ত জনোকি সংকট ক্ষণমে দূর করে।

আর যদি দেখ যে, ভগবান তোমার সংকট দূর করছেন না, তবে সে দোষ ভগবানের নয়। দোষ হল তোমার। তুমি সম্পূর্ণ মনঃপ্রাণ দিয়ে ডাকোনি। তুমি মনঃপ্রাণ দিয়ে ডাকলে ভগবান অবশ্যই তোমাকে সঙ্কট থেকে মুক্ত করতেন। অর্থাৎ তুমি সম্পূর্ণভাবে অদৃষ্টবাদী ও স্বার্থপর হও। তোমার প্রাণ রক্ষা করার জন্যও কোন প্রযত্ন করার দরকার নেই। ভগবানই তোমাকে রক্ষা করবেন। তা সত্ত্বেও যদি তোমার প্রাণ যায়, তবে মনে করবে তা ভগবানের ইচ্ছাতেই হয়েছে। ভগবানের ইচ্ছা ছাড়া কোন কিছুই হতে পারে না। আর সব থেকে বড় কথা হল, ভগবান যা করেন, তা ভালোর জন্যেই করেন।

মুসলমানরা তোমার ঘরে ঢুকে তোমার বাবাকে হত্যা করেছে, তোমার মা ও বোনকে বলাৎকার করেছে? তাতে কী হয়েছে। তোমার মা, বাবা, ভাই, বোন, সবই তো পর। তুমি পরের জন্য শোক করবে কেন? তারা নিশ্চয়ই প্রাণমন দিয়ে ভগবানকে ডাকেনই, তাই ভগবান তাদের রক্ষা করেন নি। আর তার চেয়েও বড় কথা হল, ভগবান যা করেন, তা ভালোর জন্যই করেন। মুসলমানরা তোমার বাবাকে হত্যা করেছে, তোমার মা-বোনকে ধর্ষণ করেছে, তোমার সহায় সম্পত্তি লুঠ করেছে, তোমার ঘরে আগুন দিয়েছে ও তোমার জমি জায়গা সব দখল করে নিয়েছে? তারা তোমার মঙ্গলের জন্যই তা করেছে, কারণ ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। কাজেই এই রকম এক ভক্তিবাদকে চরম অদৃষ্টবাদী কাপুরুষতা ও নপুংসকতার ভক্তিবাদ ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? সব থেকে বড় কথা হল, এই সব সাংসারিক ব্যাপারে বিচলিত হলে চলবে কেমন করে। সংসারে থাকতে গেলে এমন ঘটনা তো ঘটবেই। এই সব সাংসারিক ব্যাপার থেকে মনকে মুক্ত করে শুধু ভগবানকে ডাকতে হবে। কী করে ভবসাগর পার হবে সেই চিন্তা করতে হবে। **একমাত্র ভবসাগর পার হওয়াটাই সমস্যা, আর কোন সমস্যাই সমস্যা নয়।**

গীতা এই ক্লীব ভক্তিবাদের কথা বলে না

প্রথমেই এটা বুঝতে হবে যে, গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যা বলেছেন তার উদ্দেশ্য ছিল ক্লৈব্যগ্রস্ত অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করা। ঘরে বসে মালা জপতে বা খোল করতাল নিয়ে নাচানাচি করে হরিকৃষ্ণ কীর্তন করার জন্য নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু এ রকমের অদৃষ্টবাদী ও নপুংসক ভক্তিবাদের কথা না বলে বলেছেন

পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।

সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধায়ে সর্বকর্মণাম্॥ (১৮:১৩)

কোন কাজের সিদ্ধি ও অসিদ্ধির পিছনে পাঁচটি কারণের কথা সাংখ্য ও অন্যান্য শাস্ত্রে বলা হয়ে থাকে।

অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।

বিবিধাশ্চ পৃথক চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্॥ (১৮:১৪)

(এই পাঁচটি কারণ হল) কাজটি কোথায় করা হচ্ছে, কাজটি কে করছেন, যিনি কাজটি করছেন তাঁর কত জন সাহায্যকারী আছেন, কাজটি সুসম্পন্ন করতে তাঁরা কত ভাবে চেষ্টা করছেন এবং পঞ্চম ও শেষ কারণটি হল দৈব।

কাজেই, গীতা অনুসারে, কোন কাজের সিদ্ধি বা অসিদ্ধির ব্যাপারে ৮০ শতাংশ নির্ভর করে মানবিক প্রচেষ্টা বা পুরুষকারের ওপর আর মাত্র ২০ শতাংশ নির্ভর করে দৈবের ওপর। কিন্তু উপরিউক্ত ক্লীব ভক্তিবাদের প্রভাবে আমরা ১০০ শতাংশই দৈবের ওপর ছেড়ে দিয়ে বসে আছি।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এ রকম ক্লীব ভক্তিবাদের কথা বলেননি। তিনি বলেছেন, **তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।** (৮:৭)

অর্থাৎ, সর্বদা আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধ করতে প্রস্তুত থাকো। কিন্তু এইসব ক্লীব বৈষ্ণবের দল কৃষ্ণের উপদেশের শুধু প্রথম অংশটাই পালন করছেন। সর্বদা কৃষ্ণের নাম স্মরণ করছেন। কিন্তু দ্বিতীয় অংশ, অর্থাৎ যুদ্ধ করার অংশটি উপেক্ষা করছেন। তাই এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, আজ যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্ম নিয়ে পৃথিবীতে আসতেন, তবে তিনি এ সব ক্লীবত্বের পূজার্চনা বন্ধ করে দিতেন এবং কল্পিত ও অশাস্ত্রীয় রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ ভেঙে ফেলতেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ ভজনাকারী ক্লীব ভক্তদের ভর্ৎসনা করতেন। আর নেচে নেচে হরে কৃষ্ণ কীর্তন বন্ধ করে দিতেন। এই প্রসঙ্গে বলা উচিৎ হবে যে, শ্রীশঙ্করদেব আসামে যে বৈষ্ণব ধর্ম প্রবর্তন করছেন, তাতে রাধা অনুপস্থিত। সেখানকার বৈষ্ণবরা সুদর্শন চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহকেই পূজার্চনা করেন। মনে হয় সেই কারণেই মুসলমান আক্রমণকারীরা কোন দিনও আসামে ঢুকতে পারেনি। আসামকে পরাধীন করতে পারেনি।

সেই সঙ্গে আছে নিরামিষ ভোজন বা বৈষ্ণব মানেই নিরামিষভোজী। অর্থাৎ একটা জাতিকে যত রকমভাবে নির্বীর্য করা যায় তার প্রচেষ্টা। আর এই সব নিরামিষভোজী বৈষ্ণবের দল ভাবছেন, নিরামিষ ভোজন মানেই সাত্ত্বিক আহার এবং এই সাত্ত্বিক আহারের দ্বারা তাঁদের মোক্ষের পথ পরিষ্কার হচ্ছে। কিন্তু এই বাংলারই এক স্মার্ত পণ্ডিত বহু আগে বলে গিয়েছেন যে, যদি গঙ্গা স্নানে মোক্ষলাভ হোত, তবে গঙ্গার জলে বসবাসকারী মাছ ও অন্যান্য জলচর প্রাণী সবার আগে মুক্তি পেয়ে যেত। আর নিরামিষ খেলেই যদি মুক্তি হত তবে গরু, ছাগল ইত্যাদি তৃণভোজী প্রাণীরা সকলের আগে মোক্ষলাভ করত। গীতা হল হিন্দু ধর্মের সার। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক আহারের ব্যাপারে গীতা কী বলছে তা আলোচনা করা চলতে পারে। সাত্ত্বিক আহার কাকে বলে তা বোঝাতে গীতা বলছে **আয়ুঃ সত্ত্ব বলারোগ্য সুখ প্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ। রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরাঃ হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিক প্রিয়াঃ॥ (১৭:৮)**

অর্থাৎ আয়ু, উৎসাহ, বল, রোগহীনতা, চিত্ত-প্রসন্নতা ও রুচি বর্ধনকারী রসযুক্ত, স্নিগ্ধ, সারবান এবং প্রীতিকর খাদ্য সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয়। রাজসিক আহার বোঝাতে গীতা বলছে, **কট্বম্ল লবণাত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণ রুক্ষ বিদাহিনঃ। আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখ শোকাময় প্রদাঃ॥ (১৭:৯)** অর্থাৎ, অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, তীক্ষ্ণ বিদাহী এবং দুঃখ, শোক ও রোগ উৎপাদনকারী আহার রাজস

ব্যক্তিগণের প্রিয়।

যাতযামং গতরসং পূতি পর্যুষিতঞ্চ যৎ। উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥ (১৭:১০) অর্থাৎ, যে খাদ্য অনেক আগে রান্না করা হয়েছে, যার রস শুকিয়ে গিয়েছে, যা দুর্গন্ধযুক্ত, বাসী, উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র, তা তামসিক লোকদের প্রিয়।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল, এই শ্লোকগুলোতে কোথাও বলা হয়নি যে, সাত্ত্বিক আহার অবশ্যই নিরামিষ হতে হবে। এখানে শুধু খাদ্যের গুণাগুণ, তৈরি করার প্রণালী ইত্যাদির কথাই বলা হয়েছে। উপকরণের কথা বলা হয়নি। মাছ মাংসও যদি কম তেল মশলা দিয়ে রান্না করা হয় তবে গীতা অনুসারে তাও সাত্ত্বিক। কিন্তু সাত্ত্বিক আহারের নামে নিরামিষ আহার হিন্দু জাতির যে সর্বনাশ করেছে তা বলার কথা নয়। এক মাত্র স্বামী বিবেকানন্দই এই বিষয়টিকে যথোপযুক্ত গুরুত্ব সহকারে বিচার করছেন এবং অহিংসার নামে অস্ত্রত্যাগ ও নিরামিষ আহারকে হিন্দু জাতির পতন ও হাজার বছরের পরাধীনতার অন্যতম প্রধান কারণ বলে বর্ণনা করেছেন।

এটা খুবই পরিষ্কার যে, নিরামিষভোজী বড় জোর একটা হাতি হতে পারে, কিন্তু বাঘ বা সিংহ হতে পারে না। হাতির অনেক শক্তিই থাকতে পারে, কিন্তু হাতিকে কেউ পশুরাজ বলে না। সকলেই সেই সম্মান সিংহকেই দিয়ে থাকে। অতি শক্তিশালী সেই হাতীকে মাহুত লোহার অঙ্কুশ দিয়ে খোঁচা মারছে আর হাতি সেই মত পথ চলছে। কিন্তু কোন ব্যক্তি কোন সিংহ বা বাঘকে ওই ভাবে চালনা করতে পারবে কি?

লড়াইয়ের ময়দানে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলে যে ক্ষিপ্রতা, সাহস ও তাৎক্ষণিক তীক্ষ্ণ উপস্থিত বুদ্ধির দরকার, তার জন্য আমিষ খাদ্য বা অ্যানিমাল প্রোটিন একান্তভাবে দরকার। শুধু নিরামিষ আহার করে তা জন্মায় না। এই কারণে সামরিক বাহিনীতে নিরামিষ আহারের কোন স্থান নেই। যে মাছ বা মাংস খেতে চায় না, তাকে দিনে অন্ততপক্ষে চারটি ডিম খেতে হয়। নিরামিষ খেয়ে জপের মালা হাতে জপ করা যায়, বন্দুক তরোয়াল হাতে যুদ্ধ করা যায় না।

প্রকৃত বৈষ্ণব কেমন হবেন? এ ব্যাপারে শ্রীচৈতন্যের মত হল, এক জন বৈষ্ণব হবেন—**তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানীনা মানদেন কীর্তনীয় সদা হরিঃ॥** অর্থাৎ, সেই বৈষ্ণব হবেন তৃণের থেকেও নিচু, তরুর অত সহিষ্ণু। তিনি অমানীকেও সম্মান দেখাবেন এবং সর্বদা কৃষ্ণ-কীর্তন করবেন। কাজেই কোন মুসলমান যদি সেই বৈষ্ণবকে পা দিয়ে মাড়িয়ে যায় তবে তার উচিত হবে তৃণের মত নিচু হয়ে তা সহ্য করা। সেই মুসলমান যদি তাকে কুড়ুল দিয়ে আঘাত করে, তবে তার উচিত হবে গাছের মতই তা সহ্য করা। সেই মুসলমান যদি তার বাড়িতে আসে তবে তাকে যথাসাধ্য সম্মান দেখানো আর সব সময় কৃষ্ণ কীর্তন করা। কাজেই ক্লীবতা ও নপুংসকতার এর থেকে বড় নিদর্শন আর কী হতে পারে।

শ্রীচৈতন্য আর বলতেন 'প্রেমানন্দে বাহু তুলে বল হরি হরি বল' এটা সহজেই অনুমান করা চলে যে, কোন ব্যক্তি যদি দুই হাত তুলে হরিনাম করতে থাকে, তাহলে সে আক্রমণকারীকে আক্রমণই বা করবে কেমন করে, আর তার আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষাই বা করবে কেমন করে। তাই একজন বৈষ্ণবের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল ধেই ধেই করে বাহু তুলে হরি হরি বলে নৃত্য করা। প্রথমেই এটা বুঝতে হবে যে, গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যা বলেছেন তার উদ্দেশ্য ছিল ক্লৈব্যগ্রস্ত অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করা। ঘরে বসে মালা জপতে বা খোল করতাল নিয়ে নাচানাচি করে হরেকৃষ্ণ কীর্তন করার জন্য নয়। মুসলমানরা যখন হিন্দুদের কাটবার জন্য তরোয়ালে শান দিচ্ছে, এক দিনের মধ্যে লক্ষ হিন্দু কেটে রক্ত গঙ্গা বইয়ে দিচ্ছে, তখন আমাদের হিন্দু ধর্মাচার্য বলছেন খোল করতাল নিয়ে নাচানাচি

কর আর দুই বাহু তুলে হরেকৃষ্ণ কীর্তন কর। কারণ তাঁর উপদেশ হল—**হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্তেব নাস্তেব নাস্তেব গতিরণ্যথা॥**

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কথিত তেজবীর্যের ধর্মের কী মারাত্মক বিপথগামিতা। হিন্দু জাতিকে একটি নপুংসক জাতিতে পরিণত করার কী জঘন্য প্রচেষ্টা!

দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ নাকি শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের যুগল অবতার ছিলেন। ত্রেতার শ্রীরাম লঙ্কার দুরাচারী রাবণকে সবংশে নিধন করেছিলেন। আর দ্বাপরের শ্রীকৃষ্ণ দুরাচারী কংস, দুরাচারী জরাসন্ধ ও অন্যায়কারী কৌরবদের সবংশে নিধন করেছিলেন। কাজেই যিনি শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ, উভয়ের যুগল অবতার হবেন তাঁর মধ্যে উভয়ের গুণই বিদ্যমান থাকার কথা। তাঁর এক হুঙ্কারে মেদিনী কেঁপে ওঠার কথা। কিন্তু যেই শ্রীরামকৃষ্ণকে এই দুইয়ের অবতার বলে প্রচার করা হচ্ছে, তাঁর মধ্যে কি সেই গুণাবলী ছিল? তাঁকে দেখা যাচ্ছে দক্ষিণেশ্বরের মায়ের মূর্তির সামনে মা মা করে কাঁদছেন আর চোখের জল ফেলছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যেই সময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন তখন বিদেশী দখলদার ইংরাজ শক্তি ভারত দখল করেছিল। শ্রীরাম বা শ্রীকৃষ্ণ যেই সময় জন্মগ্রহণ করলে তাঁরা কেঁদে কেঁদে চোখের জল ফেলতেন না। তাঁরা অবশ্যই দেশের মানুষকে সংগঠিত করে সেই বিদেশী দখলদারদের পিটিয়ে দেশ থেকে তাড়াবার চেষ্টা করতেন, তাই আসল সত্য হল, শ্রীরামকৃষ্ণকে শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের যুগল অবতার বলার মধ্য দিয়ে ভারতের তেজোবীর্যের ঐতিহ্যকেই যে শুধু ভূলুণ্ঠিত করা হচ্ছে তাই নয়, শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ, দুজনকেই অপমানিত করা হচ্ছে।

সেই রকম, নবদ্বীপের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ছিলেন নাকি শ্রীকৃষ্ণের অবতার। চৈতন্য মহাপ্রভু যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন তখন অত্যন্ত দুরাচারী পাষণ্ড ও অসুর প্রকৃতির বিদেশী মুসলমান আক্রমণকারীরা ভারত দখল করেছিল। সেই পাষণ্ডের দল লক্ষ লক্ষ নিরীহ হিন্দুকে হত্যা করেছিল, লক্ষ লক্ষ হিন্দু রমণীর সতীত্ব নষ্ট করছিল। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তখন জন্মগ্রহণ করলে তিনি নেচে নেচে কীর্তন করে কেঁদে কেঁদে চোখের জল ফেলে সময় নষ্ট করতেন না। সহজেই অনুমান করা চলে যে, তিনি ঐ অত্যাচারী মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতেন। অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করে সেই অত্যাচারী মুসলমানদের তিনি যোগ্য শাস্তি দিতেন এবং তাদের সমূলে সংহার করে দেশ শত্রুমুক্ত করতেন। কাজেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে কৃষ্ণের অবতার বলার মধ্য দিয়ে শুধু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তেজোময় ও বীর্যময় ভাবমূর্তিকে ভূলুণ্ঠিত করা হচ্ছে তাই নয়, শ্রীকৃষ্ণের অপমানও করা হচ্ছে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, **পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম**—সাধুজনের রক্ষা ও অসুর প্রকৃতির লোকদের নিধন করতেই তিনি পৃথিবীতে আসেন। তাই একটি অসুরও নিধন না করে চৈতন্য মহাপ্রভু কেমন করে কৃষ্ণের অবতার হয়ে গেলেন? সব থেকে বড় কথা হল, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর মা শচীদেবী, স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া এবং আত্মীয় স্বজন, তাঁর ভক্তগণ ও বাংলার হিন্দু জনসাধারণকে মুসলমান শাসক সুলতান হুসেন শাহের কাছে পণবন্দী রেখে, তাদের মহা বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে, হিন্দু রাজ্য উড়িষ্যার নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গিয়ে নিজেকে বিপন্মুক্ত করলেন। সেটা কি ন্যায় কাজ হয়েছে? অনেকের মতে পুরীতে গিয়ে শ্রীচৈতন্য তাঁর নাচানাচি, কীর্তন ও কান্নাকাটির দ্বারা সেখানকার জনসাধারণের ক্ষাত্রতেজ ও ক্ষাত্রবীর্যকে বিনষ্ট করছিলেন বলেই সেখানকার শাসকরা তাঁকে শেষ পর্যন্ত গোপনে হত্যা করেছিল।

অনেকে বলবেন, তাঁরা ছিলেন ভক্তিমার্গের পথিক। তাই ভগবানের নামগান করাই ছিল তাঁদের কাজ। অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করা তাঁদের কাজ ছিল না। যদি তাই হয় তবে তাঁরা ভক্তিমার্গের সাধক ছিলেন, এটুকু বলেই ক্ষান্ত থাকা উচিত। তাঁদের কৃষ্ণের অবতার বা রামের অবতার বলার কি প্রয়োজন? শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের তেজোবীর্যের ঐতিহ্যকে ভুলিয়ে দিয়ে দেশের মানুষকে ক্লীবত্বের পথে

পরিচালিত করার কি প্রয়োজন? ঠিক একই ভাবে তামিলনাড়ুর শ্রীরামানুজাচার্যকে বলা হচ্ছে তিনি রামের ছোটো ভাই লক্ষ্মণের অবতার ছিলেন। শ্রী রামানুজ ছিলেন একজন নিরামিষভোজী বৈষ্ণব এবং বিশিষ্টাদ্বৈত দর্শনের প্রণেতা। রামের মত লক্ষ্মণও ছিলেন একজন ক্ষত্রিয় যোদ্ধা। তাঁর কোন গুণই আচার্য রামানুজের মধ্যে ছিল না। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার হল, তাঁর নাম রামানুজ (রামের অনুজ বা রামের ছোটো ভাই) ছিল বলেই তাঁকে লক্ষ্মণের অবতার বলে প্রচার করা হচ্ছে। আমাদের ধর্মাচার্য্যদের মতে, ভগবানকে লাভ করার অনেক পথ আছে, তাদের মধ্যে ভক্তির পথ হল রাজপথ। এই ভক্তি পথের বিধি হল, সমাজ-সংসারের কথা ভুলে গিয়ে সব সময় ভগবানকে ডাকা আর তাঁর জন্য চোখের জল ফেলা। যাঁরা মা কালীর ভক্ত তাঁরা সব সময় কালীকে ডাকছেন আর চোখের জল ফেলছেন। যাঁরা কৃষ্ণভক্ত তাঁরা সব সময় শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করছেন আর চোখের জল ফেলছেন। তাঁদের নীতি হল, কোন ক্ষেত্রেই শারীরিক বল প্রয়োগ করা চলবে না। সদা সর্বদা তৃণের মত নিচু হয়ে থাকতে হবে আর কেউ এক গালে চড় মারলে অন্য গালটি এগিয়ে দিতে হবে। তাঁদের মতে ভগবানের জন্য কান্নাকাটি করা নাকি প্রাণায়ামের কুম্ভকের সমান। আগেই বলা হয়েছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় এরকম ভক্তির কথা বলেননি। তিনি বলেছেন, **তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ,** অর্থাৎ সব সময় আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধও করতে থাকো। কিন্তু আমাদের ভক্তিমার্গের ব্যক্তিগণ গীতার প্রথম উপদেশটিকেই শুধু গ্রহণ করেছেন এবং যুদ্ধ করার উপদেশটিকে বর্জন করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ হল, ভক্তি আর শক্তি হাত ধরাধরি করে এক সঙ্গে চলবে। কিন্তু আমাদের ধর্মগুরুরা শক্তিকে বর্জন করেছেন। এই ভাবে আজকের ভক্তিবাদ পরিণত হয়েছে অত্যন্ত তামসিক একটি ক্লীবত্ববাদে। এবং এই ক্লীব ভক্তিবাদই যে আজকের ভারতের হিন্দুদের একটি ক্লীব জাতিতে পরিণত করেছে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। একজন ভক্তেরও শরীর রক্ষার প্রয়োজন আছে, সমাজ রক্ষার প্রয়োজন আছে। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নাম স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ করারও উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন। তাই সত্য কথা হল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমাজ সংসারের কথা ভুলে গিয়ে ভগবানের নাম স্মরণ করতে বলেননি। কিন্তু আজকের ভক্তিবাদের পথিকদের উদ্দেশ্য হল, দেশ ও সমাজ গোল্লায় যাক। আমি সাধন ভজন করে ঈশ্বরকে লাভ করব। আমি মোক্ষ লাভ করব।

মাংসাহারী হিন্দু বীর আজ নিরামিষভোজী কাপুরুষ

এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে, খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্ত রাজাদের রাজত্বকালের আগে এই দেশে আজকের মত এত মন্দিরও ছিল না। এবং মন্দিরের বিগ্রহকে ফুল মালা ও প্রসাদ দিয়ে পূজার্চনা করাও ছিল না। তার থেকেও বড় কথা হল তখন আজকের মত নিরামিষাশী ভক্তের দলও ছিল না। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে ডা. ভীমরাও আম্বেদকর লিখছেন, " After the death of Buddha his followers started setting up the images of the Buddha and building stupas. The Brahmins followed it. They, in their turn, built temples and installed in them images of Shiva, Vishnu and Ram and Krishna etc. — all with the object of drawing away the crowd that was attracted by the images which had no place in Brahmanism came into Hinduism" —অর্থাৎ বুদ্ধ মারা যাবার পর তাঁর শিষ্যরা নানা যায়গায় বুদ্ধের স্তূপ তৈরি করে তাতে বুদ্ধের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করল। ব্রাহ্মণরা তাদের অনুসরণ করে মন্দির তৈরি করতে শুরু করল এবং তাতে শিব, বিষ্ণু, রাম অথবা

কৃষ্ণের মূর্তি স্থাপিত করল—উদ্দেশ্য ছিল বুদ্ধ মূর্তিকে পূজা করতে স্তূপে গমনকারী জনতাকে মন্দিরের প্রতি আকৃষ্ট করা। এই ভাবেই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত মন্দির, আগে যার কোন অস্তিত্ব ছিল না তা হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত হয়ে গেল। (B. R. Ambedkar; Writings and Speeches; Department of Education, Government of India, 1990, vol. 7, p. 346). এই ঐতিহাসিক পরিবর্তনের আগে হিন্দু ধর্ম ছিল যজ্ঞ ও পশুবলির ধর্ম এবং হিন্দু ছিল একটি মাংসাহারী জাতি।

তাই বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, গুপ্ত রাজাদের শাসনকালের আগে এই দেশের হিন্দুরা একটি মাংসাহারী জাতি ছিল। কাজেই বেদ ও উপনিষদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ, অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও ষড়দর্শনের রচয়িতা দার্শনিকগণ এবং রামায়ণ ও মহাভারতের মত মহাকাব্যের রচয়িতাগণ, সকলেই মাংসাহারী ছিলেন। এক কথায় বলতে গেলে হিন্দু ধর্মের ভিত্তি প্রস্তুতকারী আমাদের পূর্বপুরুষগণ সকলেই মাংসাহারী ছিলেন। শুধু তাই নয়, শ্রীরাম, শ্রীপরশুরাম, শ্রীকৃষ্ণের মত নেতা, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অর্জুন, ভীম, সাত্যকি ও অভিমন্যুর মত বীরগণ সকলেই মাংসাহারী ছিলেন। অতি নিকট অতীতেও গুরু গোবিন্দ সিংহ, রাজা শিবাজী, রাণা প্রতাপ, রাণা সংগ্রাম সিংহ, মহারাজা রঞ্জিৎ সিংহের মত হিন্দু বীরদের সকলেই মাংসাহারী ছিলেন। এক কথায় বলতে গেলে যে সব হিন্দু বীর, যারা কখনও শত্রুর কাছে মাথা নত করেননি, বরং নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করেও মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করেছেন, হিন্দু জাতির মুখ উজ্জ্বল করেছেন, সেই সব বীর যোদ্ধাদের সকলেই মাংসাহারী ছিলেন। যুদ্ধ যাত্রা করার আগে মৃগয়া করতে যাওয়া রাজপুত রাজাদের একটি প্রথা ছিল। সেই শিকারে গিয়ে একটি বন্য বরাহ শিকার করতে পারলে তাঁরা তাকে একটি সুলক্ষণ বলে মনে করতেন। শিকার করা পশুদের মাংস দিয়ে জোর খাওয়া দাওয়া করে তাঁরা যুদ্ধে যেতেন।

কিন্তু আজকের নিরামিষভোজীর দল সেই সত্য ইতিহাসকে বিকৃত করতে উঠে পড়ে লেগেছে। তাদের মতে সেই অনাদি কাল থেকেই হিন্দুরা নিরামিষ খেয়ে আসছে এবং তারা কোন দিনই মাংসাহারী ছিল না। বলতে গেলে এই নিরামিষভোজীর দল মুসলমানদের থেকেও বেশি গোঁড়া মনোভাবাপন্ন। হিন্দুরা যে এককালে মাংসাহারী ছিল তার সমস্ত প্রমাণাদি লোপাট করতে বা বিকৃত করতে তারা ব্যস্ত। গোরক্ষপুরে গীতাপ্রেস পরিচালনা করছে একটি অতি শক্তিশালী নিরামিষভোজী গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠী অন্য একরকম ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। বাল্মীকি রামায়ণে যেই যেই শ্লোকে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের মাংস খাবার পরিষ্কার বর্ণনা আছে, সেই সেই শ্লোকের নীচে তারা পাদটীকা ছাপিয়ে দিয়েছেন। সেই সব পাদটীকায় বলা হচ্ছে যে, এই শ্লোকে মাংসের বদলে অমুক অমুক মূল বুঝতে হবে। কারণ রামের পক্ষে মাংস খাওয়া এক অসম্ভব ব্যাপার।

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করার আছে। আমাদের পুরাকালের ঋষিরা ছিলেন স্পষ্টবক্তা। তাঁরা সত্য কথা বলতে কোন ছলনার আশ্রয় নেননি। তাঁরা লুকোবার চেষ্টা করেননি যে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু, এবং পরবর্তীকালে পঞ্চপাণ্ডব তাদের সমাজ স্বীকৃত পিতার পুত্র ছিলেন না। তাঁরা লুকোবার চেষ্টা করেননি যে, দশরথ রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্নের জন্মদাতা পিতা ছিলেন না। তাঁরা ব্যাসদেব ও কর্ণের আসল পরিচয়ও গোপন করার কোন চেষ্টা করেননি। তাই বাল্মীকিও রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার মাংসাহারী চরিত্র গোপন করার কোন চেষ্টা করেননি। কারণ সেই সময় মাংসাহার করা ছিল প্রচলিত একটি স্বাভাবিক ব্যাপার।

আগেই বলা হয়েছে যে, এক কালে মাংসাহারই ভারতবর্ষ উপহার দিয়েছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ, দার্শনিক, কবি ও বীর যোদ্ধাদের। হিন্দু ধর্মের যা কিছু ভাল, যা কিছু মঙ্গলকর, তা সবই আমাদের সেই মাংসাহারী পূর্বপুরুষদের সৃষ্টি। কিন্তু বৌদ্ধ, জৈন ও বৈষ্ণবদের প্রভাবে মাংসাহার বর্জন

করে ভারত যেদিন নিরামিষভোজী হল, সেই দিন থেকেই হিন্দু জাতির দুর্ভোগ ও দুর্দশার সূত্রপাত হল। এখানে একটি লক্ষ করার বিষয় হল, অহিংসার কথা বললেও বৌদ্ধ ধর্ম মাংসাহারের বিরোধী নয়। আজও বৌদ্ধরা গোমাংস সহ সব রকম মাংসই আহার করে থাকেন। বৌদ্ধদের মতে প্রাণী হত্যা করা পাপ। কিন্তু অন্যের হত্যা করা পশুর মাংস খাওয়াতে কোন পাপ নেই। পাঠকের হয়তো স্মরণ আছে যে, অহিংসা তত্ত্বের প্রণেতা গৌতম বুদ্ধের মৃত্যু হয়েছিল বাসি শুয়োরের মাংস খেয়ে।

হিন্দুদের ক্লীব ও নপুংসক বানাতে গান্ধীর অবদান

মাংসাহারী ভারতবর্ষ যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ, দার্শনিক, কবি ও বীর যোদ্ধাদের উপহার দিয়েছে তা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু নিরামিষভোজী ভারতবর্ষ হিন্দু জাতিকে কী উপহার দিয়েছে? গুজরাটের অহিংস অবতার তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। মাংসাহারী বীরগণ ভারতের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাঁদের প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু নিরামিষভোজী ভারতের সেই অহিংস অবতার কী করলেন? তিনি নিজেকে পরিণত করলেন আরেক বিদেশী দখলদার ব্রিটিশের অত্যন্ত বিশ্বাসী, অতি অনুগত এক পদলেহনকারী দালালে। আগেই বলা হয়েছে হিন্দু শাস্ত্র আততায়ীদের প্রতি কী রকম ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছে। মনুসংহিতার(৮/৩৫০) শ্লোক বলছে যে, সেই আততায়ী যদি গুরু হয়, বালক হয় বা বৃদ্ধ হয়, ব্রাহ্মণ হয় বা বহু লেখাপড়া জানা বিদ্বান ব্যক্তিও হয়, তবে সেই অগ্রসরমান আততায়ীকে কোন বিচার বিবেচনা না করে তৎক্ষণাৎ হত্যা করতে হবে। সেখানে আরও বলা হয়েছে যে, উপরিউক্ত শাস্ত্রীয় নির্দেশ হল সেই সব আততায়ীদের জন্য যারা এক জন ব্যক্তিবিশেষের ক্ষতি করতে উদ্যত। কিন্তু যে সব আততায়ী সমগ্র একটি অসহায় ও নিরপরাধ মানব গোষ্ঠীর ক্ষতি করতে উদ্যত, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত আততায়ীদের সমূলে বিনাশ করার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, যেসব বিদেশী আক্রমণকারী ও দখলদার আমাদের মাতৃভূমিকে লুণ্ঠন করল, দেশের মানুষকে শোষণ করে চরম দরিদ্রে পরিণত করল, দেশবাসীকে হত্যা করল তারা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও ঘৃণ্য আততায়ী। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে আমাদের উচিত ছিল সেই সব আততায়ীদের সমূলে বিনাশ করা এবং দেশকে শত্রু মুক্ত করা। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ সেই গুজরাটি দালালের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে সেই চরম শত্রুদের সঙ্গে আমরা অহিংস আচরণ করেছি।

সেই গুজরাটি দালালের অনুগামীরা আজ প্রচার চালাচ্ছে যে, সেই দালালের অহিংস আন্দোলনের ফলেই ভারত স্বাধীন হয়েছে। এটা বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, একটি বাঘ যখন শিকার ধরে তার রক্তমাংস খায় তখন অহিংস কথায় সে তার শিকার ছেড়ে পালায় না। ভারতকে লুণ্ঠন করেই ব্রিটিশ শক্তি তার পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। গুজরাটি অহিংস দালালের অহিংস আন্দোলনের ফলে সেই ব্রিটিশ শক্তি তার লোভনীয় শিকার ছেড়ে পালিয়েছে, এর মত মিথ্যা কথা আর হয় না। যদি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ না হত তবে সেই গুজরাটি দালাল হাজার বছর ধরে তার অহিংস আন্দোলন করেও ভারতকে স্বাধীন করতে পারত না। দ্বিতীয় বিশযুদ্ধ চালাতে ব্রিটেন আমেরিকার কাছে দেনার দায়ে দেউলিয়া হয়ে পড়েছিল। তাই আমেরিকার নির্দেশে তাকে এশিয়া ও আফ্রিকার সমস্ত উপনিবেশগুলো ছেড়ে পালাতে হয়েছিল। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় এবং ১৯৬০ সালের মধ্যে এশিয়া ও আফ্রিকার ৬৫টি দেশ বিদেশি দখলদারদের থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। ভারতের স্বাধীনতা এই বিশ্বব্যাপী ঘটনার একটি অঙ্গ মাত্র। এর পিছনে সেই গুজরাটি দালালের বিন্দুমাত্র অবদান নেই।

যেই ৬৫টা দেশ তখন স্বাধীনতা পেয়েছিল সেই সমস্ত দেশগুলোতেও কি আমাদের গুজরাটের দালাল গিয়ে অহিংস সত্যাগ্রহ করেছিল?

আমাদের জানা আছে যে, দুঃশাসন দ্রৌপদীর অপমান করেছিল এবং সেই অপমান কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের একটা অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। সেই যুদ্ধে দুঃশাসনের বুক চিরে রক্ত পান করে ভীম সেই অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। রাবণ সীতার অপমান করেছিল, তাই রাম লঙ্কা আক্রমণ করে রাবণকে সবংশে নিধন করে সেই অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। ঐ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, দরকার হলে প্রাণ দিয়েও, হিন্দু মা-বোনের সতীত্ব ও সম্মান রক্ষা করা প্রতিটি হিন্দুর পবিত্র কর্তব্য। কিন্তু এই ব্যাপারে সেই গুজরাটি দালাল কী বলেছিল তা অনেকেরই জানা নেই। সেই দালাল বলেছিল, **কোন মুসলমান তার ঘরে ঢুকে যদি তার বোনকে ধর্ষণ করতে থাকে তবে সেই অহিংসার পূজারী গুজরাটি দালাল সেই মুসলমান ধর্ষণকারীর পায়ে চুমু খাবে।** দেশভাগের প্রাক্কালে সেই অহিংসার পূজারী গুজরাটি দালাল পাঞ্জাবের মহিলাদের পরামর্শ দিয়েছিল যে, **কোন মুসলমান যদি তাদের ধর্ষণ করতে চায়, তবে তাদের উচিত হবে সেই ধর্ষণকারীর সঙ্গে সহযোগিতা করা, তাদের নিরাশ করা নয়। তখন তাদের কাজ হবে দু-পাটী দাঁতের মধ্যে জিভ কামড়ে মড়ার মত শুয়ে থাকা।** (এই লেখকের 'ভারতীয় ঐতিহ্য ও গান্ধীবাদী অহিংসা' দ্রষ্টব্য)।

সেই অহিংস গুজরাটি দালাল ভারতবাসীকে যে নপুংসকতার মন্ত্রে দীক্ষিত করে গিয়েছে, আজও ভারতবর্ষ তার ফল ভুগছে। পাকিস্তান ও চীন তো বটেই, বাংলাদেশের মত ক্ষুদ্র দেশও ভারতকে ধমকাচ্ছে আর সেই গুজরাটি দালালের নপুংসকতার মন্ত্রে দীক্ষিত আমাদের নপুংসক নেতারা কুকুরের মত লেজ নাড়ছে। ২০০৮ সালের এপ্রিল মাসের ১৬ তারিখে আমাদের বিদেশ মন্ত্রী প্রণব মুখার্জী লোকসভায় বলেন যে, পাকিস্তান ও চীন মিলে ভারভের ১ লক্ষ ১৬ হাজার বর্গ কিলোমিটার জায়গা দখল করে আছে (The Statesman, 17th April, 2008)। এর মধ্যে ১৯৪৮ সাল থেকে পাকিস্তানের দখলে রয়েছে ৭৮,০০০ বর্গকিলোমিটার এবং ১৯৬২ সাল থেকে চীনের দখলে রয়েছে ৩৮০০০ বর্গকিলোমিটার অঞ্চল। এখানে বলে রাখা দরকার যে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মোট আয়তন হল ৮৮,৭৫২ বর্গ কিলোমিটার। কাজেই পাকিস্তান ও চীন মিলে যে জমি দখল করে রয়েছে তার পরিমাণ পশ্চিমবঙ্গের প্রায় দ্বিগুণ(১.৮ গুণ)। এখানে আরও বলে রাখা দরকার যে, ১৯৬৩ সালে পাকিস্তান ও চীনের মধ্যে এক সীমান্ত-চুক্তি হয় এবং পাকিস্তান তখন বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে অধিকৃত ভারতীয় জমি থেকে ৫,১৮০ বর্গ কিলোমিটার জমি চিনকে দান করে দেয়।

এখানে আরও স্মরণ করা প্রয়োজন যে, চীনা বাহিনী অরুণাচল প্রদেশে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখার(Line of Actual Control or LAC) থেকে অন্তত প্রায় ২০ কিমি ভিতরে ঢুকে সুমদরং উপত্যকা, আস্পালিয়া ও লুঙ্গর-কর এলাকায় বিস্তীর্ণ ভূভাগ দখল করে নিয়েছে। তারা তাওয়াং জেলায় একটি হেলিপ্যাড(helipad) বা হেলিকপ্টার অবতরণ ক্ষেত্রও তৈরি করে ফেলেছে। সেই ১৯৬২ সালের চীনা আক্রমণের পর থেকেই চীন ভারতের জমি দখল করার কাজ নিরবচ্ছিন্ন ভাবেই চালিয়ে যাচ্ছে। এবং এ ভাবে তারা অরুণাচল প্রদেশের প্রায় ২০০০ বর্গকিমি জায়গা দখল করে নিয়েছে। উপরন্তু চীনা নেতারা সমগ্র অরুণাচল প্রদেশটাকেই চিনের অংশ বলে দাবি করে চলেছে। সেই কারণে চীনা সরকার অরুণাচলের কোন অধিবাসীকে চীন ভ্রমণ করার ভিসা দিতে অস্বীকার করছে। অতি সম্প্রতি চীনা সরকার আমাদের সিকিম রাজ্যের কিছুটা অংশ চীনের ভূখণ্ড বলে দাবি জানিয়েছে। চীনা সৈন্য ভারতে ঢুকে ভারতের ২০০০ বর্গকিমি জায়গা দখল করে নিয়েছে, অথচ ভারতের তরফ থেকে তার কোন প্রতিবাদই জানানো হচ্ছে না। এই ব্যাপারে আন্তর্জাতিক আইন বলছে, **কোন দেশ অন্য কোন**

দেশের জমি যদি ১২ বছর তার অধিকারে রাখতে পারে তবে সে জমির ওপর তার অধিকার জন্মে যায়। তখন সেই জমি ফেরত পাওয়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

কিন্তু এ সব ব্যাপার নিয়ে সেই অহিংস গুজরাটি দালালের অনুগামীদের কোন মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। সেই সব ক্লীব রাজনীতিকের দল ব্যস্ত রয়েছে ভোটের রাজনীতি নিয়ে। তারা ব্যস্ত রয়েছে মুসলমান ভোটারদের তোষণ করার কাজে। তাদের মাথাব্যথা হল কী করে মুসলমানদের ব্লক ভোট পাওয়া যাবে এবং সেই ভোটের সাহায্যে নির্বাচনে জিতে কী করে ক্ষমতায় থাকা যাবে। পাঠককে এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, আজকের মুসলিম তোষণের নোংরা রাজনীতি মুখ্যত সেই অহিংস গুজরাটি দালালেরই অবদান। তাই আমাদের কাপুরুষ ও নপুংসক নেতারা পাকিস্তান ও চীনের কাছ থেকে সেই জমি কোন দিন ফিরিয়ে আনবে সে আশা দুরাশা মাত্র। সে দিন বেশি দূরে নেই, যে দিন এই নেতারা বলবে যে, চীনের দাবি ন্যায্য দাবি, তাই পুরো অরুণাচল প্রদেশটা চীনকে দিয়ে দাও।

এ সব কথার উদ্দেশ্য এই নয় যে, যেই সব হিন্দু নিরামিষ আহারে অভ্যস্ত হয়েছেন, এখনই তাঁদের আমিষ খাওয়া শুরু করতে হবে। এ সব কথা বলার উদ্দেশ্য হল, এককালে হিন্দু সমাজ কেমন ছিল, বা আমাদের পূর্বপুরুষরা কেমন ছিলেন, কোন কিছু গোপন না করে তার সত্য ইতিহাস সকল হিন্দুর কাছে তুলে ধরা। দেশের প্রতিটি হিন্দুর অধিকার আছে তার দেশ, জাতি ও সংস্কৃতির প্রকৃত ইতিহাস জানার। ভবিষ্যতের কোন পদক্ষেপ যাতে ভুল না হয় তার জন্যই সত্য ইতিহাস জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। সত্য ইতিহাস গোপন করা বা তাকে বিকৃত করে পরিবেশন করা এক মারাত্মক অপরাধ এবং যাঁরা আজ তা করছেন তাঁরা অবশ্যই এক মারাত্মক অপরাধ করছেন। তাঁদের সেই সব মিথ্যা প্রচারকে স্তব্ধ করার জন্যও সত্য ইতিহাস প্রচারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। একমাত্র সত্য ইতিহাস জানা থাকলেই কোন হিন্দুর পক্ষে ভবিষ্যতে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হবে।

এ ছাড়াও আরও একটি ব্যাপারে দেশ আজ এক ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন। তা হল অতি দ্রুত মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি। চারটি উপায়ে মুসলমানরা তাদের সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে, তা হল, **(১) পুরুষের বহু বিবাহ, (২) পরিকল্পিত ভাবে এবং স্বেচ্ছায় পরিবার পরিকল্পনার কার্যসূচী বর্জন, (৩) পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে ব্যাপক অনুপ্রবেশ এবং (৪) অন্য ধর্মাবলম্বীদের ইসলামে ধর্মান্তরকরণ।** কিন্তু কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলো তাদের মুসলমান তোষণের নীতি দ্বারা চালিত হয়র এ ব্যাপারে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে চলেছে। এখানে আরও একটা লক্ষ্য করার বিষয় হল, আরবের টাকা না পেলে ভারতের বেশিরভাগ রাজনৈতিক দলের পক্ষে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই মুশকিল। তাই কোন রাজনৈতিক দলই এ বিষয়ে সরব হচ্ছে না। আর বর্তমান পরিস্থিতি যদি বিনা বাধায় চলতে থাকে তবে বিশেষজ্ঞদের মতে আগামী ৪০ বছরের মধ্যে ভারত একটি মুসলিমপ্রধান দেশে পরিণত হবে। অর্থাৎ হিন্দুদের আবার মুসলমানের দাসত্ব করতে হবে।

এটা সকলেরই জানা আছে যে, ব্রিটিশ শক্তি ভারত দখল করার আগে ভারতের হিন্দুরা ৭০০-৮০০ বছর মুসলমানের দাসত্ব করেছে। কেমন ছিল সেই মুসলমান দাসত্বের চরিত্র? একটা উদাহরণ দিলে তা বুঝতে সুবিধা হবে। একদিন মুঘিসুদ্দিন নামে এক কাজি সুলতান আলাউদিন খিলজীর রাজসভায় আসে। আলাউদ্দিন তখন সেই কাজিকে জিজ্ঞাসা করল, "খরজ গৌজার (বা জিজিয়া প্রদানকারী) এবং খরজ দিহ (বশ্যতার নিদর্শন স্বরূপ অধিক কর প্রদানকারী) হিন্দুদের সঙ্গে ইসলামী শাস্ত্র মুসলমানদের কি রকম ব্যবহার করতে নির্দেশ করে?" জবাবে মুঘিসুদ্দিন বলে, "তারা হল জিজিয়া প্রদানকারী জিম্মী। জিজিয়া আদায়কারী মুসলমান কর্মচারী তাদের কাছে রৌপ্যমুদ্রা দাবি করলে তাদের উচিত

হবে সসম্মানে ও বিনয়ের সাথে স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করা। সেই কর আদায়কারী যদি রেগে গিয়ে তাদের দিকে নোংরা বা ধুলো ছুড়ে মারে তবে তাদের উচিত হবে হাঁ করে তা গিলে ফেলা। এই ভাবেই তারা সেই কর আদায়কারীকে সম্মান দেখাবে। এইভাবে বিনয়ের সাথে কর দিয়ে এবং বিনা প্রতিবাদে নোংরা গিলে তারা বশ্যতার প্রমাণ দেবে এবং এর মধ্যে দিয়েই ইসলামের গৌরব ও মেকি ধর্মের (অর্থাৎ হিন্দু ধর্মের) হীনতা প্রতিষ্ঠিত হবে। স্বয়ং আল্লা তাদের ঘৃণা করেন এবং বলেন, "তাদের সর্বদা পরাধীন করে রাখো"। **হিন্দুদের এইভাবে সদা সর্বদা হীন করে রাখাই আমাদের কর্তব্য, কারণ তারা আল্লার রসুলের (অর্থাৎ নবী মহম্মদের) চিরস্থায়ী শত্রু। তাছাড়া আল্লার রসুল আমাদের নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন, "তাদের হত্যা কর, লুণ্ঠন কর এবং তাদের ক্রীতদাসে পরিণত কর। তাদের দাসত্ব করতে বাধ্য কর।"** ইসলামের মহান টীকাকার হানিফার মত হল, **"হিন্দুদের ওপর জিজিয়া চাপিয়ে দাও"** (অর্থাৎ তাদের জিম্মী হিসাবে গণ্য কর), এবং আমরা সেই মহান হানিফাকেই অনুসরণ করি। অন্যান্য টীকাকারদের মতে হিন্দুদের সামনে দুটো রাস্তা, **"হয় ইসলাম নয় মৃত্যু"** (জিয়াউদ্দিন বারনি, তারিখ-ই-ফিরোজশাহী)।" বিগত ৭০০/৮০০ বছরের মুসলমান পরাধীনতার আমলে হিন্দুরা কী বিড়ম্বনাময় জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছে, উপরিউক্ত কথোপকথন তার একটি প্রামাণ্য দলিল।

কাজেই গ্লানিময় সেই মুসলমান পরাধীনতার দিন যাতে ফিরে না আসে তার জন্য অনতিবিলম্বে হিন্দুদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, নিজের ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষা করতে হলে সময় নষ্ট না করে হিন্দুদের এখনই কিছু করা উচিত। অন্যথায় আরও এক বার দাসত্ব করার জন্য হিন্দুদের প্রস্তুত থাকতে হবে। সেই সঙ্গে এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, এবার যাদের দাসত্ব করতে হবে তারা পশ্চিমের সাহেব নয়। তারা আমাদের এশিয়ারই প্রতিবেশী।

হিন্দুদের মধ্যে তেজোবীর্য ফিরিয়ে আনতে স্বামী প্রণবানন্দের প্রচেষ্টা

তাই প্রশ্ন হল—এই পরিস্থিতিতে হিন্দুর কী করা উচিত? আগেই বলা হয়েছে যে, আজকের ক্লীব ভক্তিবাদ এবং শুধু ফুল বাতাসা দিয়ে পূজার্চনা ও নাম কীর্তনই ভারতের হিন্দুদের একটি ভীরু কাপুরুষ ও ক্লীব জাতিতে পরিণত করেছে। তাই আজকের ধর্মাচরণ ও পূজার্চনার একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের আশু প্রয়োজন। এই ব্যাপারে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দজী কী বলেছেন তা বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন।

স্বামী প্রণবানন্দজী ছিলেন জন্মসিদ্ধ মহাপুরুষ ও দ্রষ্টা। তাই শুধু ফুল চন্দন ও চিনি বাতাসা দিয়ে হিন্দু দেবদেবীর পূজার অসারতা তিনি সহজেই বুঝতেই পেরেছিলেন। তাই তিনি বলতেন—এবার শুধু ফুলের পূজায় হবে না। বীর্য্যের পূজা চাই। যে দেবতার যে ভাব, যে লীলা, যে অস্ত্রশস্ত্র, তাই দিয়ে পূজা করলে তবে সেই দেবতার শক্তি ও আশীর্ব্বাদ লাভ ঘটে। শিবের প্রীতি ত্রিশূলে; শ্রীরামচন্দ্রের প্রীতি ধনুর্বাণে; শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা সুদর্শন; দশভুজা দুর্গার প্রীতি দশপ্রহরণে।

এই ভাব সহজ ভাবে বোঝাবার জন্য তিনি কবিতারও সাহায্য নিয়েছিলেন। এই রকম একটি কবিতার কয়েকটি পংক্তি হল—

যত পূজা তুমি করেছ হিন্দু পড়ে নাই মোর পায়,
হীনবীর্যের ক্লীবতার পূজা স্বীকার করি না তায়
অত্যাচারের প্রতিরোধে যবে
ভীম প্রতিজ্ঞা লও যদি সবে

সেই দিনে তব প্রার্থনা-ধ্বনি পশিবে আমার কানে।
শুধু ফুলে পূজা নেবো না এবার কাতর কাকুতি গানে।

বিগত দেশ বিভাগের প্রাক্কালে পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা মুসলমানদের হাত থেকে ধর্ম ও জীবন মান রক্ষা করতে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিল। সকলেরই স্মরণ আছে যে দেশবরেণ্য ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পূর্বপাকিস্তান থেকে এই পশ্চিমবঙ্গ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু অনেকেরই জানা নেই যে, স্বামী প্রণবানন্দজীই এই কাজে শ্যামাপ্রসাদকে প্রেরণা জুগিয়েছিলেন। তিনিই ড. শ্যামাপ্রসাদকে বালিগঞ্জের আশ্রমে ডেকে এই কাজের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই পশ্চিমবঙ্গ আজ ইসলামী পশ্চিমবঙ্গে পরিণত হতে চলেছে। জোয়ারের জলের মত বাংলাদেশ থেকে মুসলমান অনুপ্রবেশকারীর আগমন ও মুসলমানদের অত্যধিক জন্মহারের ফলে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা যে ভাবে হু হু করে বাড়ছে তাতে আর পাঁচ কি দশ বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ১০/১৫টি জেলা মুসলমান প্রধান হয়ে যাবে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে বর্তমান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল সরকারের শাসন ও মুসলমানের নগ্ন তোষণ। এই নগ্ন মুসলমান তোষণ যে পশ্চিমবঙ্গের ইসলামীকরণকে ত্বরান্বিত করবে তা বলাই বাহুল্য। গোয়েন্দা বিভাগের খবর হল, মুসলমানরা তখন ভাগীরথী নদীর পুবপারের সমস্ত জমি বৃহৎ বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি করবে। কাজেই প্রশ্ন হল, আবার দেশভাগ হলে হিন্দুরা কোথায় যাবে? এক বঙ্গোপসাগর ছাড়া হিন্দুর আর যাবার কোন জায়গা থাকবে না।

সেই অবস্থায় মুসলমানদের সঙ্গে একটা শেষ লড়াই হিন্দুদের লড়তেই হবে। কিন্তু আজকের ক্লীবত্বে নিমগ্ন হিন্দু জাতি কি সে লড়াই লড়তে পারবে? হিন্দুরা আজ ক্লীবত্বের এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সত্য কথা বলার সাহস পর্যন্ত তারা হারিয়ে ফেলেছে। হিন্দু ধর্মের তুলনায় ইসলাম যে একটি আসুরিক তত্ত্ব বিশেষ, সেই সত্য কথাটা বলার মত সাহসও তারা হারিয়ে ফেলছে। হিন্দু আজ এতটাই ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হয়েছে যে, সে নিজের শক্তিবাড়িয়ে নিজেকে নিজে রক্ষা করার কথা চিন্তা করতা পারছে না। ভাবছে দুর্গা, কালী, শিব, কৃষ্ণ অথবা নিদেনপক্ষে লোকনাথ এসে তাদের রক্ষা করবেন। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল, কেউ কাউকে রক্ষা করে না। নিজের রক্ষা নিজেকেই করতে হয়। দেশ বিভাগের প্রাক্কালে পূর্ববঙ্গে ও পশ্চিম পাঞ্জাবে যে ব্যাপক হিন্দু হত্যা হয়েছিল, তখন কোন অবতার হিন্দুদের রক্ষা করেত আসেননি। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ যখন মুসলাম্না প্রধান হবে এবং ব্যাপক হিন্দু হত্যা হবে, তখনও তাদের রক্ষা করতে কোন অবতার এগিয়ে আসবেন না। নিজেদের রক্ষা হিন্দুদের নিজেদেরই করতে হবে।

অনেক হিন্দু আশা করেন যে, সরকারি পুলিশ-প্রশাসন এবং বিশেষ একটি রাজনৈতিক দল তাদের রক্ষা করবে। কিন্তু সে আশা দুরাশা মাত্র। বর্তমানে ভারতবর্ষে এমন কোন রাজনৈতিক দল নেই যেই দল মুসলমানদের ব্লক ভোটের জন্য লালায়িত নয় এবং তাদের ভোট পাওয়ার জন্য মুসলমান তোষণ করছে না। তাই আজ সব রাজনৈতিক দলই মুসলমান ভোটের জন্য মুসলমান তোষণকারী দলে পরিণত হয়েছে এবং তার কখনোই হিন্দুর স্বার্থ দেখবে না। অপর দিকে রাজ্যগুলির সরকারও মুসলমান তোষণকারী রাজনৈতিক দলগুলি দ্বারা পরিচালিত। সেই কারণে এই সব রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসনও মুসলমানদের স্বার্থই রক্ষা করবে। আক্রমণকারী মুসলমানদের খুশী করার জন্য তারা আক্রান্ত হিন্দুদেরই গ্রেপ্তার করে হাজতে ভরবে।

ভবিষ্যতে যে দলই ভোটে জিতে ক্ষমতায় আসুক না কেন, তাতে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না। কাজেই, এই অবস্থায় হিন্দুদের নিজেদেরই নিজেদের রক্ষা করতে হবে। হাতে হাতিয়ার তুলে নিতে হবে। **প্রত্যেক হিন্দুর ঘরে অস্ত্র ঢোকাতে হবে। এই ভাবে ভক্তির সঙ্গে**

শক্তিকে যুক্ত করতে হবে এবং লড়াইয়ের ময়দানে মুসলমানদের সঙ্গে সম্মুখ-সমরে লড়াই করে পশ্চিমবঙ্গের ইসলামীকরণ রুখতে হবে। এ লড়াই হিন্দুদের জিততেই হবে। অন্যথায় মুসলমানদের ক্রীতদাস হয়ে কুকুরের জীবন যাপন করতে হবে।

তাই হিন্দুদের বর্তমান বিপথগামী ক্লীবত্বের হিন্দু ধর্মের বদলে সত্যিকার তেজোবীর্যের হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করতে হবে। শাক সবজীর সঙ্গে পরিমাণ মত মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি আমিষ খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেক হিন্দুকে অস্ত্র দিয়ে দেবদেবীর আরাধনা করতে হবে। প্রত্যেক হিন্দুর ঘরে অস্ত্র রাখতে হবে। এইভাবে হিন্দুর মধ্যে সাহস ও তেজোবীর্যের সঞ্চার করতে হবে। তবেই হিন্দু তার ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষা করতে পারবে। হিন্দু তার জীবন। মান ও সম্পদ রক্ষা করতে পারবে। অন্যথায় যে মুসলমানের গোলাম হয়ে কুকুরের জীবন যাপন করতে হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই আজকের এই সঙ্কটময় মুহূর্তে হিন্দুর সামনে স্বামী প্রণবানন্দজী প্রদর্শিত পথই বাঁচার একমাত্র পথ।

উপসংহার

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল যে, স্বামী প্রণবানন্দ কোন নতুন কথা বলেননি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যা বলেছেন, স্বামী প্রণবানন্দ তারই পুনরাবৃত্তি করেছেন মাত্র। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, শুধু ভক্তি নয়, শক্তি ও ভক্তিকে এক সাথে হাত ধরাধরি করে চলতে হবে এবং তাই তিনি বলেছেন।

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময়্যর্পিত মনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যসংশয়ঃ॥(৮/৭)

—অর্থাৎ, সব সময় আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধের জন্যও প্রস্তুত থাক এবং এইভাবে মন ও বুদ্ধি আমাতে অর্পণ করলে অবশ্যই আমাকে পাবে। কিন্তু পরবর্তীকালে আমাদের ধর্মাচার্যগণ ভক্তি থেকে শক্তিকে পৃথক করে ফেললেন এবং শুধু ভক্তিকেই প্রাধান্য দিলেন আর শক্তির অবহেলা করলেন। তাই ক্রমে শক্তি অবলুপ্ত হল এবং শক্তিহীন ভক্তি তামসিক ও কাপুরুষতার ভক্তিতে পরণত হল। হিন্দু ধর্ম শুধু ফুল বেলপাতা ও চিনি বাতাসা দিয়ে পূজার্চনা আর পার্থিব বস্তু কামনা করে কান্নাকাটি ও চোখের জল ফেলার ধর্মে পরিণত হলো। এই ভ্রান্তির কারণ কী?

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ আরও দু-জায়গায় সদা সর্বদা তাঁর নাম স্মরণ করার উপদেশ দিয়েছেন, যেমন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি যুক্তৈবমাত্মানং মৎ পরায়ণঃ॥ (৯/৩৪)
এবংমন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥(১৮/৬৫)

এই শ্লোক দুটো পড়লে ভ্রান্তি আসা স্বাভাবিক যে, ভগবান হয়তো সব কাজকর্ম ফেলে রেখে শুধু বসে বসে নাম জপ করতে বলেছেন। কিন্তু এখানে বুঝতে হবে, কোন্ পরিস্থিতিতে ভগবান এই কথা বলেছেন। তিনি ভয়ঙ্কর এক যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনকে এই কথা বলেছেন। এই শ্লোক দুটিতে যদি কর্মত্যাগ করে নাম জপ করা বোঝাতো, তা হলে তিনি অর্জুনকে বলতেন যে, যুদ্ধটুদ্ধ করে কাজ নেই। যাও তুমি কোন বনে গিয়ে নির্জ্জনে আমার নাম জপ করতে থাক। পক্ষান্তরে তিনি অর্জুনকে বলেছেন, যুদ্ধ তোমাকে করতেই হবে। তা হলে, এ সবের মধ্যে রহস্য লুকিয়ে আছে কোথায়?

প্রকৃতপক্ষে, মনে মনে সদা সর্বদা ভগবানের নাম স্মরণ করাই যোগ ব আভক্তিযোগ। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুঙ্কে এই যোগের কথা বলেছেন যাতে অর্জুন এই যোগের আশ্রয় নিয়ে তাঁর কর্তব্য কর্ম বা ধর্ম আরও সুচারুরূপে সমাধা করতে পারেন। কারণ **যোগঃ কর্মসু কৌশলম্**। নিষ্কাম কর্মই হল গীতার সর্বপ্রধান উপদেশ এবং এক মাত্র যোগের সাহায্যে কর্ম করলেই মানুষ সেই নিষ্কাম কর্মে সমর্থ হয়।

অর্জুন ছিলেন ক্ষত্রিয় এবং তাঁর স্বভাবজাত কর্ম বা ধর্ম হল যুদ্ধ করা এবং যুদ্ধে শত্রু বিনাশ করা। তাই তিনি তাঁকে সদা সর্বদা ভগবানের নাম স্মরণ করতে বলেছেন যতে অর্জুন ভক্তিযোগকে আশ্রয় করে নিষ্কামভাবে যুদ্ধ কর্মে লিপ্ত হতে পারেন। সব থেকে বড় কথা হল, ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে শক্তিরও সাধন আকরতে হবে। যেমন শক্তিহীন ভক্তি নয়, তেমনি ভক্তিহীন শক্তিও নয়। কারণ **শক্তিহীন ভক্তি যেমন মানুষকে ভীরু ও কাপুরুষে পরিণত করে, সেই রকম ভক্তিহীন শক্তি মানুষকে দানবে পরিণত করে।**

আগেই বলা হয়েছে যে, আজকের ক্লীব ভক্তিবাদই ভারতের হিন্দুদের একটি ক্লীব জাতিতে পরিণত করেছে। আর এই ক্লীব ভক্তিবাদের প্রবক্তাদের উদ্দেশ্য হল, দেশ ও জাতি গোল্লায় যাক। আমি সাধন ভজন করে নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটাব এবং মোক্ষ লাভ করব। এখানেই স্বামী প্রণবানন্দের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মাচার্য্যগণের তফাৎ। তিনি কখনও সাধন ভজন করে শুধু নিজের মুক্তির কথাই ভাবেননি। পক্ষান্তরে, তিনি বলতেন, আমি সারা জীবন শুধু জাতি গঠনের মন্ত্র জপ করেছি। চরম ক্লীবত্বে নিমগ্ন হিন্দু জাতিকে আবার জাগ্রত করতে, সংঘবদ্ধ করতে স্বামী প্রণবানন্দজী তাঁর সমগ্র জীবন ব্যয় করেছেন। হিন্দু জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য তিনি গ্রামে গ্রামে হিন্দু মিলন মন্দির স্থাপন করেত চেয়েছিলেন এবং তা করেও ছিলেন। তিনি বলছেন যে, মুসলমানরা যেমন মসজিদকে কেন্দ্র করে সঙ্ঘবদ্ধ হয়, আমিও সেই রকম হিন্দু মিলন মন্দিরকে কেন্দ্র করে হিন্দু জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে চাই। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, কাপুরুষতায় নিমগ্ন হিন্দু জাতিকে তার চরম শত্রু মুসলমানদের থেকে রক্ষা করতে হলে তাদের শরীর চর্চা ও অস্ত্র চালনায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তাই তিনি সমস্ত হিন্দু মিলন মন্দিরে শরীর চর্চার সঙ্গে লাঠি খেলা, ছোরা খেলা ইত্যাদি অস্ত্র চালনায় হিন্দু যুবকদের সুশিক্ষিত করে তোলার প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন। গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে থাকা হিন্দু মিলন মন্দিরগুলোতে আজও সেই অভ্যাস জারি আছে।

কুম্ভকর্ণ যখন গভীর ঘুমে নিমগ্ন ছিল তখন রাবণের আজ্ঞায় রাক্ষসরা তাকে প্রথমে ঢাক ঢোল কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে জাগাবার চেষ্টা করল। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। তারপর রাবণ নিজে গিয়ে তাকে 'কুম্ভকর্ণ কুম্ভকর্ণ' বলে ডাকল, তখন কুম্ভকর্ণ ধড়মড় করে উঠে বসল। তাই ঘুমন্ত হিন্দু জাতিকে জাগাবার জন্য স্বামীজী বলতেন, আমি হিন্দুদের হিন্দু বলেই ডাক দিতে চাই। আমাই সমগ্র হিন্দু জনসাধারণকে 'আমি হিন্দু আমি হিন্দু' জপ করাবো। এই হিন্দুত্ববোধ জাগার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিলুপ্ত তেজোবীর্য, শক্তি-সামর্থ্য জেগে উঠবে।

আজ বাংলাদেশ তো বটেই, এই পশ্চিমবঙ্গেও যেই যেই অঞ্চলে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই সেই জায়গায় হিন্দুর বাড়ীতে মুসলমানরা ডাকাতি করছ, হিন্দু মা-বোনের উপর বলৎকার করছে এবং আরও নানা অত্যাচার ও উৎপীড়ন চালাচ্ছে। যদি হিন্দুরা গীতার উপদেশ অনুসরণ করে ঘরে গরে অস্ত্র মজুদ রাখে এবং সেই অস্ত্র দিয়ে একটা ডাকাতেরও ধড়-মুণ্ড আলাদা করতে পারে, তবে ঘটনা অবশ্যই অন্য খাতে বইবে। যদি কোন হিন্দু মা-বোন গীতা অথবা মা কালী অথব আমা দুর্গার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বঁটি বা কাটারি বা অন্য কোন অস্ত্র দিয়ে একটি ধর্ষণকারীর ধড়-মুণ্ড আলাদা করতে পারে, বা তার যৌনাঙ্গ কেটে ফেলতে পারে, তবে ঘটনা অন্য খাতে বইবে। কোন হিন্দু মহিলার গায়ে হাত দেওয়ার আগে কোন মুসলমান দশ বার ভাববে।

আগেই বলা হয়েছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন সর্বদা আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক। **কিন্তু খালি হাতে যুদ্ধ করা যায় না। তাই উপরিউক্ত উপদেশের মধ্য দিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সব হিন্দুকে ঘরে অস্ত্র মজুদ রাখতে বলেছেন। কাজেই গীতার উপদেশ অনুসারে প্রত্যেক হিন্দুকে**

ঘরে অস্ত্র মজুত রাখতে হবে এবং সেই অস্ত্র প্রয়োজনে আত্মরক্ষা ও শত্রুকে আঘাত করার কাজে ব্যবহার করতে হবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিতে হবে যে, বিনা যুদ্ধে কাউকে জমি ছেড়ে দেব না। হয় মারবো নয় মরবো, বিনা যুদ্ধে এই পশ্চিমবঙ্গের এক চুল জমিও কাউকে ছেড়ে দেবো না। যদি আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশ মেনে চলি তবে তিনি যে আমাদের সহায় হবেন তাতে কোনই সন্দেহ নেই। এই ভাবে ঘরে অস্ত্র রাখার মধ্য দিয়ে হিন্দু তার শৌর্য-বীর্য ফিরে পাবে এবং হিন্দু জাতি বিশ্বের অন্যতম সাহসী পরাক্রমশালী জাতিতে পরিণত হবে। নিজের মাটি রক্ষা করতে সমর্থ হবে।

ইসলাম সম্পর্কে কয়েকজন মনীষীর মত

"ইসলামের সৌভ্রাতৃত্ব (মিল্লাৎ) সমগ্র মানব জাতির জন্য নয়। এ হল মুসলমানদের মধ্যে মুসলমানদের সৌভ্রাতৃত্ব। এই সৌভ্রাতৃত্বের সুফল শুধু মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যারা বাইরে তাদের জন্য আছে শুধু ঘৃণা ও শত্রুতা।" বাবাসাহেব আম্বেদকর, *Pakistan or Partition of India Government of Maharashtra Publication, Page 330*

"মানবজাতির প্রতি ইসলামের ভালবাসা এক চূড়ান্ত মিথ্যাচার। ইসলামের অস্তিত্বের মূলে রয়েছে অমুসলমানদের প্রতি ঘৃণা। অমুসলমানদের শুধু নরকের অধিবাসী বলেই ইসলাম ক্ষান্ত থাকছে না। মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে চিরস্থায়ী এক ঘৃণা ও সংঘাত বিদ্যমান রাখাই ইসলামের উদ্দেশ্য।" *Islam, Principality Publications(UK), Page 28*

"মুসলমানরা মুখে বলে চলেছে সর্বজনীন সৌভ্রাতৃত্বের কথা, কিন্তু বাস্তবে কী দেখা যাচ্ছে? কোন অমুসলমান ব্যক্তির পক্ষে এই ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্ভব নয় তো বটেই, বরং তার গলা কাটা যাবার সম্ভাবনাই দেখা দেবে।" *স্বামী বিবেকানন্দ, জ্ঞানযোগ*

"তাহাদের (মুসলমানদের) মূলমন্ত্র, 'আল্লা এক এবং মহম্মদই এক মাত্র পয়গম্বর'। যাহা কিছু ইহার বহির্ভূত সে সমস্ত কেবল খারাপই নহে, উপরন্তু সে সমস্ত তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করিতে হইবে; যে কোন পুরুষ বা নারী এই মাতে সামান্য অবিশ্বাসী তাহাকেই নিমেষে হত্যা করিতে হিবে; যাহা কিছু এই উপাসনা পদ্ধতির বহির্ভূত তাহাকেই অবিলম্বে ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে; যে কোন গ্রন্থে অন্যরূপ মত প্রচার করা হইয়াছে সেগুলিকে দগ্ধ করিতে হইবে। প্রশান্ত মহাসাগর হিতে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত ব্যাপক এলেকায় দীর্ঘ পাঁচশত বৎসর ধরিয়া রক্তের বন্যা বহিয়া গিয়াছে। ইহাই মুসলমান ধর্ম।" *স্বামী বিবেকানন্দ, Practical Vedanta*

"জিহাদের অর্থ হল, পৃথিবীর যে সমস্ত অঞ্চল বিধর্মী কাফেরদের দখলে রয়েছে, সে সমস্ত অঞ্চলকে জয় করা। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র কোরানের আইন বা কোরানের শাসন প্রতিষ্ঠা করাই জিহাদের অন্তিম লক্ষ্য।" *আয়াতুল্লা খোমেনি*

Author

The author, Dr. Radhasyam Brahmachari, M. Tech. Ph. D. was a brilliant scholar of science, studied at Vidyasagar College, Narendrapur Ramakrishna Mission and the University of Calcutta, with unique academic achivements at his credit. He retired from the Department of Applied Physics, University of Calcutta as a professor.

The learned author, despite being a man aof science, was equally conversant in literary, historical and spritual spheres, including Vedic philosophy and philosophies of other Indian schools. In his lifetime, he was widely acclaimed as an outstanding authority in comparative studies of religions.

He was also a well-known writer of a large number of highly thoughtful books that are being appreciated by thoughtful men and women, both in India and abroad. He was also a renowned columnist and his masterly writings frequently appeared both in Bengali and English print media.